টিয়নচন্ডী

কিশোর সাহিত্য বার্ষিকী

সম্পাদনা

অনিন্দ্য ভুক্ত

লিইবার ফিয়েরা

উড়নচণ্ডী ৩ (Uranchandi III)

প্রকাশবর্ষ ২০২১

মুখ্য উড়নচণ্ডী
অনিন্দ্য ভুক্ত

উপমুখ্য উড়নচণ্ডী
অংশুলা দাশগুপ্ত, অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব

প্রচ্ছদ
সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিন্যাস
অরূপ ঘটক

জনসংযোগ
মৌমিতা মাইতি, অরিত্রজয় দাস

প্রচার ও বিপণন
অলোক ব্যানার্জী

টিম এল.এফ.বুকস
শিল্পা ঘোষ (হাওড়া), সুকান্তা সেন (গড়িয়া), সৌরভ পাল (বাঁকুড়া), অর্ণব শেঠ (খানাকুল), সম্পূর্ণা দত্ত (চন্দননগর), ঋতি মোহান্ত (কৃষ্ণনগর), শ্রেয়সী সেন (দক্ষিনেশ্বর), অঙ্কিতা ব্যানার্জি (মুর্শিদাবাদ), প্রদীপ রায় (কোচবিহার), শুক্তি চ্যাটার্জি (সোদপুর), অনিন্দ্যসুন্দর বসু (আসানসোল), কোয়েনা দাশগুপ্ত (খড়দহ), দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায় (আসানসোল), শুভঙ্কর দে (পশ্চিম বর্ধমান), সুদীপ দাস (কোচবিহার)

মুদ্রক
প্রিন্ট-ও-প্রসেস, ১৫/৫, কে. বি. সরণী, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০৮০

দাম **৩৪৯ টাকা**

প্রকাশক
লিইবার ফিয়েরা
দেবনাথ হাউস, কবি সুকান্ত রোড, নবপল্লী, বারাসত, কলকাতা ৭০০১২৬

Website: https://lfbooksindia.com

উড়ো কথা

বাপরে! কী ডানপিটে ছেলে!

সাধে কী আর নাম রেখেছি উড়নচণ্ডী!

তিন বছরে তিনজন প্রকাশকের কাছে ঘোরা হয়ে গেল। আর তার মানেই, উড়নচণ্ডীকে সবাই ভালবেসে ফেলেছে। তবে ও কথা দিয়েছে, আর বেশি ছটফট করবে না। আসলে বয়সও তো হচ্ছে, তাই না? তি..ই..ইন বছর। আর শুধু তো বয়স হওয়া নয়, প্রায় দু'বছর তো করোনার অত্যাচারে ঘরে বসেই কাটছে। ঘরের মধ্যে আর কাঁহাতক ছটফট করা যায়! ঠিক যেমন এরপর আর স্কুলে গিয়ে ছোটাছুটি করার দম কতটা থাকবে তা বলা মুস্কিল। ওর বাবা যেমন, ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে বলে রোজ নিয়ম করে ছাদে চল্লিশ মিনিট হাঁটাহাঁটি করেন। কী কারণ, না বাবার অফিস যেতে আর আসতে ঠিক চল্লিশ মিনিট লাগে, আর সে পথটা বাবা হেঁটে যান বলে অভ্যেসটা বজায় রাখছেন।

এসব বুড়োটে-মার্কা অভ্যেস উড়নচণ্ডীর পোষাবে না। তার দিন কাটছে এখন দিব্যি শুয়ে বসে। একটা বিছানা, একটা মোবাইল আর আনলিমিটেড ইন্টারনেট কানেকশন, বিন্দাস জীবন কাটানোর জন্য আর কী চাই! কাজের মধ্যে দুই— খাই আর শুই। ছোটবেলা থেকে শুনে আসা বাক্যটা যে এত সার্থক হয়ে উঠবে তা আর কে জানত!

ভাবভঙ্গিখানা উড়নচণ্ডীর এখন এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই কাজটা যে ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। এই যে পুজোর আগেই ওর মতো ছেলেমেয়েদের হাতে একটা আস্ত বার্ষিকী তুলে দেওয়ার জন্য লেখা জোগাড়, সেগুলোকে ঠিকঠাক করা, ছবি আঁকানো, তারপর ছেপে, বাঁধিয়ে, সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া— সারাক্ষণ আমার পাশে ঘোরাঘুরি করা, হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করার থেকে, এই কাজগুলোতে যে ওর প্রবল উৎসাহ, সেটা বেশ বুঝতে পারি। এই অস্থির সময়ে, হাজার সমস্যার মধ্যেও যে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারলাম এই বার্ষিকী, উড়নচণ্ডী পাশে না থাকলে সেটা পারতামই না।

হাতে এত বড় একটা বই পেলে, তোমরাও উড়নচণ্ডীর মত ছটফটানি বন্ধ করে বাড়ি বসে বইটা পড়ে ফেলো। বাইরে বেরোবে কম, স্বাস্থ্যকর খাবার খাবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। দেখবে করোনা যতই লড়াই চালাক, শেষপর্যন্ত 'উই শ্যাল ওভার কাম'।

আর এক
উড়নচণ্ডী

সূচিপত্র

উপন্যাস

দারুমা সান, দীপুমাসি আর হ্যাকারের গল্প
যশোধরা রায়চৌধুরী ৪২

একা সেই লোকটা
রাজা ভট্টাচার্য ৯৮

দ্বীপান্তরের রাজপুত্র
শুভময় মণ্ডল ২২২

ভূতের নাম ক্ষেত্রপাল
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ১৯৪

হীরক রহস্য
অনিন্দ্য ভুক্ত ১৫২

বড় গল্প

ঘটোৎকোচ জেঠুর বাজার-কিসস্যা
ভগীরথ মিশ্র ১৬

ভূতটা ঘরেই ছিল
চন্দন নাথ ৬২

আগাছাদমন
কৃষ্ণেন্দু দেব ১২৫

হাতিহানার জঙ্গলে
গার্গী মুখোপাধ্যায় ১৮০

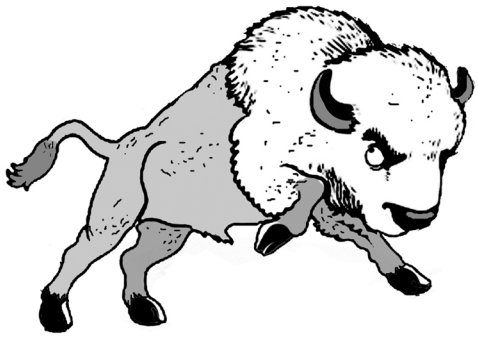

স্মৃতিকথা

আমার স্কুল জীবন
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ৬

জীবন মানেই ম্যাজিক
পি সি সরকার (জুনিয়র) ৫৮

এক শিল্পের জন্ম এবং আমি
যোগেশ দত্ত ৫৬

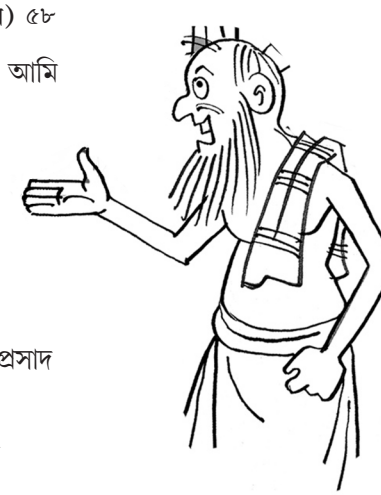

নিবন্ধ

ভাষা মানে কী
পবিত্র সরকার ৩৯

গণিত প্রতিভা গণেশ প্রসাদ
শ্যামল চক্রবর্তী ১১৯

আকাশপুরের রূপকথা
সমৃদ্ধ দত্ত ১৬৮

ছোট গল্প

কার্তিক গণেশ দুই ভাই
অমর মিত্র ২৭

হনুবাবা
স্বপ্নময় চক্রবর্তী ৩০

দয়াপরবশ সামন্ত
রতনতনু ঘাটী ৩৪

মির কাশিমের সুড়ঙ্গ
ইন্দ্রনীল সান্যাল ৭০

আমাদের নবীন রাজা
হেমেন্দুশেখর জানা ১৮৭

ছোটগল্প

মাঝরাতে দুঃখের কথা
গৌর বৈরাগী ১৪৫

মৃত্যুবালুকা
ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ৭৪

হ্যাপি ডে
অরিন্দম বসু ১৪৭

পাইথন পেরুমল
শিশির বিশ্বাস ১৩৮

পনিটেল কাণ্ড
বিপুল মজুমদার ১৪২

নাচতে না জানলে
অনন্যা দাশ ৭৮

রাতে ঘুমাতে চাই
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪

রুকসাম গ্রামের বিগ্রহ
আবীর গুপ্ত ২১৮

কেমন মজা
চুমকি চট্টোপাধ্যায় ১৭৭

লকারের চাবি
দেবদুলাল কুণ্ডু ২৫০

প্রশ্ন করা চলবে না
দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৪

প্রাগৈতিহাসিক অভিযান
বৈশাখী ঠাকুর ২৪১

বাঁকুড়ায় বিভ্রাট
শাশ্বতী দাস ২৪৫

ভারমুক্তি
মেধস ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১

পাতারিআত্মা
অরুণাভ বিশ্বাস ২৫৪

ফিচার

বন্যপ্রাণ ও বন্যপ্রাণী
সব্যসাচী চক্রবর্তী ১৭৩

সিনেমা বানাতে হলে
সৌমিত্র দস্তিদার ২১১

অচেনা আগ্রা
স্বস্তিক মল্লিক ১২২

কমিক্স

ঝানু চোর চানু
কাহিনি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
চিত্রনাট্য ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২

আমার স্কুল জীবন

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

শিল্পী: সুদীপ্ত মণ্ডল

আমি একটা অন্য লেখা লিখলেই পারতাম। গম্ভীর কোনও প্রবন্ধ অথবা বেশ একটা রচনা। তাতে আমার ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছে একটা পরীক্ষাও দিয়ে দেওয়া যেত। ছাত্রজীবনে তাঁরা আমাকে কীরকম শিখিয়েছেন, না শিখিয়েছেন তারও একটা

ধারণা দিয়ে দেওয়া যেত এই সুযোগে। কারণ, আমি নামে একটা কলেজের মাস্টার হলেও, এখনও ছাত্রই রয়ে গিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের আমার এখনও ভীষণ ভয় করে। ইংরেজিতে লিখব? ভয় করে, কোথা থেকে অনিলবাবু এসে লাল কালির খোঁচা দিয়ে প্রলম্বিত স্বরে বলবেন "নো-ও-ও। প্রিপজিশনাল লিস্টটা কি এখনও মুখস্থ হয়নি? এই 'ভার্বের' পরে যে একটা 'টু' হবে সেটা কি এখনও বলে দিতে হবে? গোল্লা পাবে।'

এই গোল্লা পাওয়ার ভয়েই আর ভারী প্রবন্ধ লেখার মধ্যে গেলাম না। বাংলায় লিখতেও আমার কম ভয় নেই কারণ, রথীনবাবু বোধ হয় এখনও আছেন। তিনি বলবেন "সবই ঠিক আছে, কিন্তু এটা কী একটা লেখার স্টাইল?' ইতিহাসের বিষয় নিয়ে যে লিখব, তারই কী বিপদ কম? দেবব্রতবাবু বলে বসবেন "লেখাটা কি আরও একটু 'কমপ্যাক্ট' করা যেত না, বড় ছড়িয়ে গিয়েছে যে! যাও রি রাইট কর।' এত ভয় নিয়ে কী আর লেখা হয়! আমি তাই বড় সড় গম্ভীর বিষয়ের মধ্যে মোটেই যাচ্ছি না। বরঞ্চ ছাত্রজীবনে যেমনটি ছিলাম, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে যেভাবে 'সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু' 'সহ জীবন, সহ ভাবনা করেছি' তারই একটা দলিল তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষে সেই সব সুখস্মৃতি আমার কাছে হীরের মতই উজ্জ্বল।

যা লিখতে যাচ্ছি অথবা যতটুকু লিখতে যাচ্ছি তার মধ্যে পড়াশুনোর কথা বেশি কিছু নেই। বস্তুত আমাদের সময়ে কথাটা বেশ বুড়ো বুড়ো শোনাচ্ছে, হয়তো বুড়োই হয়ে গিয়েছি, তাই বলছি, আমাদের সময়ে পড়াশুনোটা কখনই মাথার ওপর চেপে বসত না। পড়াশুনো বা পরীক্ষা নিয়ে এখন যে কৃত্রিম চাপ সর্বত্র লক্ষ করি তা আমাদের সময় একেবারেই ছিল না। এমন কখনওই হত না যে, পড়াশুনো আছে বলে বিকেলে ডাংগুলি খেলা যাবে না, পড়াশুনো আছে বলে কানা দত্তর বাড়ির পেয়ারা চুরি করা যাবে না, এমনকি পড়াশুনো আর পরীক্ষা আছে বলে মামাতো দাদার বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে দু'দিন পেটখারাপ হয়েও বাড়িতে শুয়ে থাকা যাবে না এত কষ্ট বা এত শৃঙ্খলা আমাদের কোনও সময়েই ছিল না। আর ইস্কুল? সে তো অখণ্ড আনন্দের আরেক নাম। হ্যাঁ, সেখানে পড়াশুনো আছে; কিন্তু সেটাই সব নয়। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ইস্কুল যদি শুধুমাত্র পড়াশুনোর জায়গা হত, তাহলে সেটা কখনওই সুখস্মৃতির বিষয় হতে পারত না। ইস্কুলে পড়াশুনো আছে, দুষ্টুমি আছে, হাসি আছে, ঠাট্টা আছে, ভালবাসা আছে, মারামারি আছে, মার খাওয়া আছে, মাস্টারমশাইদের নিয়ে রসিকতা আছে এবং আবারও পড়াশুনো আছে। অর্থাৎ পড়াশুনোটা এই সামগ্রিক চলনশীলতার একটা অঙ্গমাত্র, ওটাই সব নয়।

সব নয় বলেই আমার ইস্কুলের জীবনে শুধুই পড়াশুনো নেই। আর ইস্কুলের সুখস্মৃতি লিখতে গিয়ে পড়াশুনোর কথাও তাই বলতে পারব না। আমি আগে যথেষ্ট দুষ্টু এবং পড়াশুনোয় যথেষ্ট বাজে ছেলে ছিলাম। আমার সেজদাদা আমার অবস্থা দেখে করুণা করে এই তীর্থপতি স্কুলে এনে ভর্তি করে দিলেন। আর তারপর কীরকম করে যেন একটু একটু করে ভাল ছেলে বনে গেলাম। ভাল পড়াশুনো করেছিলাম বোধহয় তার ফল। কিন্তু পড়াশুনোর এই ফলে আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহিত ছিলাম না এবং তীর্থপতি ইস্কুলে যে সেই কারণেই নির্মিত এমন কথাও আমার কদাপি মনে হত না।

আমার মনে আছে, তীর্থপতি ইস্কুলে আমার প্রথম ক্লাসটি ছিল সুবোধবাবুর। তিনি আমাদের অঙ্ক করাতেন। আমি অঙ্কে ভাল ছিলাম না। অঙ্ক পারতাম না দেখে সুবোধবাবু আমাকে বেশ ঘেন্না দিয়ে দিয়ে কথা বলতেন। অন্যদিকে আমাদের ক্লাসের উৎপল খুব ভাল অঙ্ক করত, আর সুবোধবাবু যখন তখন তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাদের বলতেন 'দেখ, তোদের মতই দেখতে, তোদের মতই বুদ্ধি, অথচ ও পারে, তোরা পারিস না। ওর পা ধুয়ে জল খা।' আমাদের সময়ে তাবৎ মা বাবা এবং অবশ্যই কোনও কোনও মাস্টারমশাই প্রায়ই কারণে অকারণে এই কথাটি বলতেন। যে ফার্স্ট হত অথবা যে ভাল ফল করত তার পা ধোয়া জল যে তার অজান্তে কত ছেলেকেই পান করতে উপদেশ দেওয়া হত তা বলে বোঝাতে পারব না। অপিচ সেই পবিত্র পাদরজোবিধৌত জল পানে অতি শীঘ্রই যে ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব তা আমাদের মাতা পিতারা বারংবার আমাদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করতেন।

এতে যে আমাদের পড়াশুনোয় খুব উন্নতি হত তা বলতে পারি না। বরঞ্চ এই ঘৃণা মাখানো কথায় তারই ওপরে আমাদের সবচেয়ে বেশি রাগ হত, যে বেচারা ফার্স্ট হয়েছে। আমাদের যা হয়েছে, তা অবশ্য ওই রাগের ফলেই হয়েছে। 'আজিকালি' অবশ্য এসব কথা বলা একেবারে বারণ ওতে নাকি আজকাল সুকুমারমতি বালক বালিকার হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং ভবিষ্যতে তাদের ব্যক্তিত্ব তৈরি হওয়ার পক্ষে নাকি এসব কথা তীব্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। হবেও বা। কিন্তু আমাদের সুবোধবাবু এসব ব্যক্তিত্ব নির্মাণের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ঘৃণামিশ্রিত কথাবার্তায় আমি হঠাৎ অঙ্কে কিছু ভাল ফল করে ফেললাম। এই অসাধারণ একটি গো-বধে তাঁর এতই

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী: (২৩ নভেম্বর ১৯৫০) বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার গোপালপুরে বেড়ে ওঠা। কৈশোর থেকে কলকাতার অধিবাসী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর। গুরুদাস কলেজের অধ্যাপক ও ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। 'দেবতার মানবায়ন', 'মহাভারতের অষ্টাদশী', 'কথা অমৃতসমান', 'কলিযুগ' ইত্যাদি তাঁর জনপ্রিয় সৃষ্টি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বড় ও ছোটদের জন্য নিয়মিত লেখক।

আনন্দ হল যে, ক্লাস নাইনে আমাকে 'সায়েন্স' নেওয়ানোর জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমিও বিনা পদ জলপানেই কিঞ্চিৎ ভাল রেজাল্ট করে ফেলায় হঠাৎই বড় বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমার পিতাঠাকুর আমাকে চিনতেন। তিনি এই আপাতিক বিজ্ঞানমনস্কতায় মোটেই প্রশ্রয় দিলেন না। ওদিকে সুবোধবাবুর সুপারিশ আমার ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত পৌঁছল। পিতৃদেব ইস্কুলে এসে আমার চিরকালীন অক্ষমতার বিরাট ফিরিস্তি দিয়ে তাঁকে বিরত করলেন। সুবোধবাবুর কাছে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানালেন আমাকে বিজ্ঞান ভাবনা থেকে মুক্তি দেবার জন্য। বলাবাহুল্য সুবোধবাবু এতে মোটেই খুশি হননি। তিনি বললেন "ঠিক আছে আর্টস-ই পড়, কিন্তু অঙ্কটা নে একটা বিষয় হিসাবে। সব দায়িত্ব আমার।" আমার পিতাঠাকুর তবুও রাজি হননি।

অঙ্ক যখন রইলই না, তখন আবার অঙ্ক করা কেন? আমাদের সময় আর্টস পড়লেও হায়ার সেকেন্ডারিতে ক্লাস টেন পর্যন্ত কোর ম্যাথেমেটিক্স করতে হত। ইলেভেন ক্লাসে এই অঙ্ক যেহেতু সঙ্গী থাকবে না, তখন যথারীতি অবহেলা করতে করতে আমি অঙ্কে প্রায় ফেল করার সুযোগ করে ফেললাম। এই অবস্থায় আমার ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার রবিবাবু যদি না থাকতেন তাহলে আজকেও আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করতাম কিনা সন্দেহ। লম্বাটে অদ্ভুত চেহারার রবিবাবুকে দেখে অনেকেই, মানে ছাত্রেরা মোটেই পুলকিত হত না। তিনি নস্যির টিপ হাতে নিয়ে, দিগন্তপ্রসারী গভীর দৃষ্টিতে পাঁচ মিনিট একদিকেই তাকিয়ে থাকতেন এবং পাঁচ মিনিটের নস্যি নেওয়ার প্রস্তুতি এক মুহূর্তে বিচিত্র ভঙ্গিমায়, বিচিত্র শব্দে শেষ করে আকস্মিকভাবে পড়া ধরতেন। এই আকস্মিকতার ফল আমার পক্ষে সুখকর ছিল না। রবিবাবু কান মুলতে আরম্ভ করলে পনের মিনিটের কমে থামতেন না এবং পনের মিনিট পরে কানটি এমন অবস্থায় ফেরত পাওয়া যেত, যাতে সেটিকে আপন কোনও অঙ্গ বলে অনুভূতি হত না। কানটি এখনও ঠিক থাকায় কানের হাড়গোড় এবং তার শক্তি সম্বন্ধে আমি অতিরিক্ত আস্থা বোধ করি।

ক্লাস টেনে আমি শেষ পর্যন্ত ছাপান্ন পেয়ে অঙ্কে পাশ করলাম তা অবশ্যই ওই রবিবাবুর কানমলার গুণে। আমি অন্যান্য বিষয়ে ভাল ছিলাম কিন্তু সেই ভালটা সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য ক্লাস টেনে অঙ্কে পাশ করার প্রয়োজন ছিল। সেটা হল শুধুই রবিবাবুর জন্য। তিনি বিলক্ষণ বুঝেছিলেন অঙ্কে যদি আমি গোলমাল করে ফেলি, তাহলে অন্য বিষয়ে ভাল হওয়ার কোনও মানেই হবে না। মনে আছে ক্লাস টেনে অঙ্কে কৃতকার্য হবার পর পর আমি রবিবাবুর বাড়িতে ছুটেছিলাম, তাঁকে প্রণাম করার জন্য। যতদূর মনে পড়ে বাড়িটা চেতলায় ছিল। তিনি গায়ে তেল মাখতে মাখতে আমাকে বললেন, "কানমলা খাবি?" আমি হেসেছিলাম। রবিবাবু আর কোনও দিন কানমলা দেননি। অমন রুক্ষ, শুষ্ক, শুঁটকো চেহারার মানুষটির মধ্যে ভালবাসাও যে কত কঠিন আবর্তে ঢাকা ছিল তা ভাবলে আজও আমি বিস্মিত হই।

কানমলার কথায় আরও একজন শিক্ষকের কথা আমার স্মরণে আসে। তিনি অবশ্য স্কুলে বেশিদিন ছিলেন না। এমনও হতে পারে তিনি বি.এড-এর প্র্যাক্টিস টিচিং-এর জন্য আমাদের স্কুলে এসেছিলেন যতদূর মনে হচ্ছে তাই-ই হবে, কারণ, তাঁর নাম মনে নেই। অন্যায় আচরণকারী কোনও বালকের কাছে তিনি স্বয়ং উঠে যেতেন না। তিনি চেয়ারে বসে থাকতেন এবং ডান হাতটিকে ছাত্রদের কানের সাধারণ উচ্চতায় রেখে হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখতেন। তাঁর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং অন্য চতুরঙ্গুলির মাঝখানটা ব্যাঙের হাঁ-এর মতো ফাঁক করা থাকত। অন্যায়কারী বালককে আপনি এসে নিজের কান উঁচু বা নীচু করে, মাস্টারমশাইয়ের হাতের উচ্চতায় এনে, গলিয়ে দিতে হত বুড়ো আঙুল আর অন্য আঙুলগুলির মাঝখানে। আঙুলগুলি "লকড" হয়ে যাবার পর, অর্থাৎ কানমলা শেষ হয়ে যাবার পর বালক চলে যেত। হাতটি শূন্যেই ভাসত। এবার অন্য বালক। এই কানমলার মধ্যে জোর ছিল না খুব। কিন্তু এই বিচিত্র পদ্ধতিতে কানমলা খেতে আমাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমরা স্বেচ্ছায় সামান্য এবং হালকা অন্যায় আবিষ্কার করতাম এবং স্বেচ্ছায় সেই মাস্টারমশায়ের অঙ্গুলি যন্ত্রের হাড়িকাঠে নিজেদের কর্ণ বলিদান করতাম। এই বলিদান দেখে যে সপ্তম সুরে আবারও খ্যাক খ্যাক করে হাসতে পারত, তারই যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল শিক্ষক মহাশয়ের ডাক পাওয়ার। এত করেও যে পেত না, আমরা ভাগ্যহত বলে মনে করতাম।

যাঁরা এখনও আমার এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন যে, আমাদের উৎসাহ অতিরিক্ত পরিমাণে শিক্ষা কেন্দ্রিক ছিল না। আমাদের উৎসাহের বিষয় ছিল অনন্ত, মাস্টারমশাইদের হৃদয়ে ছিল অন্তর্গূঢ় প্রশ্রয়। পড়াশোনা চলত এরই ফাঁকে। দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয় না, তেমনই দুষ্টুমি এবং অন্যায়ের নিত্য নৈমিত্তিক ফিকির বার করতে আমাদের কখনওই বেশি সময় লাগত না। একবার ক্লাস টেনে বাংলার নির্ধারিত শিক্ষক আসেন নি। ক্লাসে এলেন হরিদাসবাবু। হরিদাসবাবুর গতিপ্রকৃতি একটু অন্যরকম ছিল। তিনি প্রায়ই তাঁর ধুতির কোঁচার খুঁট নাকে চাপা দিয়ে হাঁটতেন, কথা বলতেন একটু চেপে এবং মেপে। তিনি ক্রোধী ছিলেন না এবং মারধর করলেও সেটা নারায়ণ দেবনাথের 'বাঁটুলের' অনুভূতিতে আমরা সুড়সুড়ির মধ্যে গণ্য করতাম।

সেই হরিদাসবাবু ক্লাসে এসেছেন। ছাত্রদের মধ্যে বেশ একটা আনন্দের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। হরিদাসবাবু নাকে ধুতির খুঁট চাপা দিয়ে রোল কল করে গেলেন, যে দাঁড়িয়েছিল, তাকে অঙ্গুলি সংকেতে বসতে বললেন। একটি ছেলেকে অঙ্গুলি সংকেতেই উঠতে বললেন। হরিদাসবাবু কথা বেশি বলতেন না এবং পৃথিবীর অনেক গণ্ডগোল, দুর্ঘটনা তিনি

সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতে পারতেন আমাদের কল-চাপল্য তো বটেই। উঠে দাঁড়ানো ছেলেটিকে হরিদাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'কী পড়ানো হচ্ছিল?' সে জবাব দিল 'বঙ্কিমচন্দ্রের "বসন্তের কোকিল"।' তিনি বললেন 'পিসটা পড় দেখি ভাল করে।' আমরা একেক জনে একেক পরিচ্ছেদ পড়তে আরম্ভ করলাম। এখানে একটু থামতে হবে আমাদের।

ক্লাস টেনে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিপক্কতা নাই থাকুক, অন্যান্য বিষয়েও যে খুব পরিপক্কতা ছিল তা নয়। আমাদের মতো ছাত্রদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশি ছিল, তাদের গলার স্বরের সঙ্গে হৃদয়টাও অল্প অল্প ভেঙে গিয়েছিল। তারা যে ক্লাস পালিয়ে সিনেমা দেখেছে, কিছু কিছু অদ্ভুত গন্ধের বই পড়েছে, এমন কী রাস্তায় দু'একটি মেয়ের সঙ্গেও তারা যে আলাপ করেছে তাতে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যতখানি বেড়েছিল, কৌতূহল বেড়েছিল তার চেয়ে বেশি। বিশেষত রমণী বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি তখনও যথেষ্ট অপরিষ্কার থাকার ফলে আমাদের এই বয়স্ক বন্ধুগুলি আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানোন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করত। সে চেষ্টায় লাভ যে খুব বেশি হত তা নয়, তবে বালকের চেতনায় যে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসার উদয় হত, তাতে সন্দেহ নেই। এই কৌতূহলে রমণীর স্কুটাস্কুট রহস্য আমাদের কাছে আরও বেশি রহস্যময় হয়ে গিয়েছিল।

আমরা হরিদাসবাবুর কথা মতো "বসন্তের কোকিল" পড়ছি। তিনি নাকে ধুতির খুঁট চাপা দিয়ে যথারীতি শুনে যাচ্ছেন, কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে কথারও উত্তর দিচ্ছেন। এরই মধ্যে পাঠরত বালক পড়ে চলল। আবারও একটু থামি। আমাদের পাঠ্য বইতে 'বসন্তের কোকিলের' মাঝামাঝি জায়গায় একটি লাইন ব্র্যাকেট করা ছিল। আমি মূল কমলাকাণ্ডে এই ব্র্যাকেট দেখিনি, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ হয়তো সেই পংক্তিটি বাদ দেওয়ার জন্য অথবা হয়তো সুকুমার মতি বালকদের অতিরিক্ত কৌতূহল জিইয়ে রাখার জন্যই সেই পংক্তিটি ব্র্যাকেট করে রেখেছিল। পাঠরত বালক পড়তে পড়তে এবার বলল 'যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুর শ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না (পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে) তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সে বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, "কু উঃ"।"

যে এই পরিচ্ছেদটি পড়ছিল, সে বড়ই গোবেচারা ছেলে। যা পড়ছিল, তা যে এমন কিছু শ্লীলতার ব্যাঘাত ঘটায়, তাও নয়। কিন্তু বাক্যের মধ্যে 'পূর্ণযৌবনা' এবং 'সুন্দরী' শব্দটি আছে, অতএব এক মুখর স্বভাব বালক হরিদাসবাবুকে অতি বিনয় সহকারে প্রশ্ন করল 'স্যর! এই লাইনটার ব্যাখ্যা কীভাবে লিখতে হবে?' প্রাথমিকভাবে এড়িয়ে যাবার জন্য হরিদাসবাবু বললেন, 'কোন লাইনটার কথা বলছিস?' মুখর বিনা মুখ কুঞ্চনে সপ্রতিভভাবে জবাব দিল 'এই যে স্যর! এই লাইনটা পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর ন্যায় ইত্যাদি বলে সে লাইনটা পুরো পড়ে দিল।' হরিদাসবাবুর মনে যাই থাকুক, তিনিও তাঁর মুখে একটুও ভাব বিকার না ঘটিয়ে বললেন 'এই লাইনের ব্যাখ্যা পরীক্ষায় আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। কাজেই ওটা নিয়ে তোমার বেশি মাথা ঘামাতে হবে না।' ছেলেটি ছাড়ল না, বলল 'স্যর! পরীক্ষার কথা তো কিছু বলা যায় না, স্যর! তাছাড়া আপনি তো আর কোশ্চেন করবেন না, যিনি করবেন, তিনি এই লাইনটার ব্যাখ্যা যদি পরীক্ষায় দেন, তবে আমরা বড়ই বিপদে পড়ব।' অতি গৌরবের এই বহুবচন প্রয়োগে হরিদাসবাবু এবার একটু বিরক্তই হলেন যেন। তিনি নাকের ওপর থেকে কোঁচার খুঁট সরিয়ে নিয়ে বললেন 'দেখ বাপু! এই লাইনের ব্যাখ্যা যদি আসে, তবে আর যে যাই করুক, তুমি অন্তত ফেল করবে না।' ছেলেটি এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝল না দেখে হরিদাসবাবু তিক্ত স্বরে বললেন 'তবু এই লাইনটির অর্থ যদি তুমি কিছুই না বুঝে থাক, তবে বাড়িতে গিয়ে এটা তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি উপযুক্ত উত্তর দেবেন, ব্যাখ্যাও করে দেবেন।' ছেলেটি এবার বসে পড়ল বটে, কিন্তু ক্লাসময় হাসি ছড়িয়ে রেখে সে বুঝিয়ে দিল তার কোনও অপমান হয়নি।

ছেলেটি এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝল না দেখে হরিদাসবাবু তিক্ত স্বরে বললেন 'তবু এই লাইনটির অর্থ যদি তুমি কিছুই না বুঝে থাক, তবে বাড়িতে গিয়ে এটা তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি উপযুক্ত উত্তর দেবেন, ব্যাখ্যাও করে দেবেন।'

নাকের ওপর থেকে হরিদাসবাবুর কোঁচার খুঁট সরে গেল মানেই হরিদাসবাবু এখন 'সিরিয়াস'। কেননা, লঘু অবস্থায় ওই মুষ্টিবদ্ধ কোঁচার তলাতেই তাঁর দু'একটি বিগলিত দর্শনের হাসিটি থাকত লুক্কায়িত, অনেক হাস্য পরিহাস এবং মৃদু মন্দ প্রশ্নও চলত ওই কোঁচার খুঁটের তলা থেকেই। নাকে কাপড় দেওয়া ছাড়া হরিদাসবাবুকে আমরা কল্পনাই করতে পারতাম না এবং কেন তিনি এইভাবে কাপড় চাপা দিয়ে চলতেন তা নিয়ে আমাদের আলোচনা গবেষণারও কোনও অন্ত ছিল না। কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি থেকে কখনও সখনও এক অদ্ভুত দুর্গন্ধ বেরুত এবং সে গন্ধ আমাদের খনিকটা সয়েও গিয়েছিল।

হরিদাসবাবু সেই কারণেই নাসিকা রুদ্ধ করতেন কিনা, আমার জানা নেই, তবে ল্যাবরেটরির এই দুর্গন্ধ একবার আমাদের বড়ই আমোদের সৃষ্টি করেছিল। সেদিনও ছিল হরিদাসবাবুরই ক্লাস।

কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি থেকে যে দুর্গন্ধ সেদিন বেরুচ্ছিল তা এমনই মাত্রাছাড়া রকমের বদ ছিল যে, ক্লাস রুমের প্রথমদিকের বেঞ্চে বসা ছেলেরা প্রায় সবাই নাকে রুমাল অথবা হাত অথবা যে যা পারে, তাই চাপা দিয়ে বসেছিল। এমন সময় স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে হরিদাসবাবু নাকে খুঁট চাপা দিয়ে ক্লাসে এলেন। তিনি সবাইকে ওই রকম নাকে রুমাল চাপা অবস্থায় দেখে ছাত্রদের শিক্ষকানুকরণ প্রবৃত্তির জন্য ক্রোধী হয়ে উঠতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোনও রাগই করলেন না। উল্টে কোঁচার খুঁটটি আরও দ্বিগুণ জোরে নিপুণভাবে নাকের ওপরে চেপে ধরে সেই লম্বমানপটাবৃত মুখেই নানা জিজ্ঞাসাসূচক ভঙ্গী করে জানতে চাইলেন "কী হয়েছে?" কেউ কোনও জবাব দেয় না, তারাও হাসে, আর বলে "না স্যর! কিছুই হয়নি।" কিন্তু নাকের রুমাল কেউ নামায় না। হরিদাসবাবু গভীর অভিনিবেশ সহকারে ছাত্রকুলের মুখ এবং তার অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করে নিজে নিজেই একটি সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কোঁচার খুট সামান্য সরিয়ে বললেন "তোদের মধ্যে যে এই দুষ্কর্ম করেছিল, সে জল খাবার নাম করে বাইরে চলে যা।"

আর, কি আশ্চর্য, সেই সময়ে 'বারিক' উপাধির একটি অসাধারণ দুষ্টু ছেলে স্বেচ্ছায় দাঁড়িয়ে উঠে বলল "স্যর! আমি যাব?" হরিদাসবাবু বললেন "ওরে হতভাগা! তোমারই এই কর্ম। তুমি জল খাবার সঙ্গে সঙ্গে সবই সেরে আসবে।" ছেলেটি বাইরে চলে গেল, এবং হরিদাসবাবু এই স্বারোপিত গোয়েন্দা কর্মে বড়ই আত্মতুষ্টি লাভ করলেন। সেদিন তিনি যেন সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছেন এইভাবে ক্লাসে পড়িয়ে গেলেন। কিন্তু সেদিনের এই ঘটনার পর থেকে আমরা হরিদাসবাবুর ক্লাস থাকলেই নাকে রুমাল চাপা দিতাম এবং যার ক্লাস পালানোর দুষ্টবুদ্ধি হত, সেই হরিদাসবাবুর আরোপিত দুষ্কর্মের দায় আপন স্কন্ধে বহন করে যথেচ্ছ বাইরে সময় কাটিয়ে আসত। অবশ্য এর মধ্যেও শিবনাথবাবুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার মতো সজাগ দৃষ্টি এবং মানসিক যোগ্যতারও একটা ব্যাপার ছিল।

আমাদের সময়ে তীর্থপতি স্কুলে পড়বে অথচ শিবনাথবাবু ভয় পাবে না এমন ছেলে ছিল না। তবু সে কথায় আমি পরে আসছি। গণেশবাবু আমাদের ইতিহাস পড়াতেন, আবার কখনও সখনও ইংরেজিও পড়াতেন। গণেশবাবু অত্যন্ত সাধাসিধে এবং সরল মানুষ ছিলেন, সিদ্ধিদাতা গণেশের মতোই সামান্য লেখাপড়াতেই তিনি ছাত্রদের ইষ্টসিদ্ধি ঘটাতেন। ইতিহাসের উত্তর লিখতে তাঁর হাতে আমরা খুব নম্বর পেতাম; কিন্তু একই উত্তর লিখে দেবব্রতবাবুর হাতে সেই নম্বর পাওয়া প্রায় দুরূহ ছিল। নম্বরের এই তারতম্যই ইতিহাসের এক শিক্ষকের চরিত্র আমাদের কাছে আপাত কঠিন এবং প্রত্যক্ষ কোমলতা প্রমাণ করে দিয়েছিল। ছাত্ররা শিক্ষকদের সঙ্গে ব্যবহার করত এই প্রমাণেই। গণেশবাবু ক্লাসে এলে আমরা যথেচ্ছ হইচই এবং যথেচ্ছ পড়াশুনা করতাম। কোনওটাতেই তিনি বাধা দিতেন না। একটি ছাত্র গণেশবাবুকে খাতা দেখাচ্ছে এই অবসরে অন্য ছাত্র তাঁরই পিছনে দাঁড়িয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করছে এবং সমস্ত শ্রেণীকক্ষ হাসিতে ফেটে পড়ছে এতে গণেশবাবুর খাতা দেখা ব্যাহত হত না। তিনি নির্বিকার চিত্তে অন্য একটি খাতার অধিকারীকে ডাকতেন এবং সেই খাতা দেখার সময়টুকু আমাদের দুষ্টুমি চলত। এরই মধ্যে ফাঁকা দরজার মধ্যে দিয়ে যদি শিবনাথবাবুর দৃষ্টি পড়ত, তবে ঠিক সেই সময়ে যে ভাগ্যহত ছেলেটি দুষ্টুমি করছিল, তার ডাক পড়ত বাইরে, আর সমস্ত ক্লাস কোন অলক্ষিত মন্ত্রবলে চুপ করে যেত। গণেশবাবু পড়িয়ে যেতেন। মনে মনে ভাবতেন বুঝি তাঁরই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের শ্রেণীকক্ষ বুঝি নিবাত নিষ্কম্প হয়ে বসে আছে।

আমাদের হেডমাস্টারমশাই অমিয়বাবু একবার 'টিউটোরিয়াল' ক্লাস নেবার ব্যবস্থা করলেন। যাদের ভালর জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন, তারা মোটেই এ ব্যাপারে উৎসাহিত ছিল না। সমস্ত ইস্কুল ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, এই অবস্থায় একটি ক্লাস সর্নিবন্ধে পড়াশুনা করছে এ অবস্থা অনেক ছাত্রেরই অসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বেঞ্চি ভাঙত, ক্লাসরুমের ইলেকট্রিক বাল্ব চুরি করত এবং শিক্ষকমহাশয়ের ক্বচিৎ অনবধানতার সুযোগে দেশপ্রিয় পার্কের পাশে প্রিয়া সিনেমা হলের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করত। এই টিউটোরিয়ালেই আমরা অনিলবাবুকে ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম। অনিলবাবু আমাদের 'রেগুলার' ক্লাস নিতেন না। কিন্তু এই 'টিউটোরিয়াল'-এই তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি আবিষ্কার করি। তাঁর কাছ থেকে আমি যতটুকু ইংরেজি শিখেছিলাম, সে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে গিয়েছে।

ইস্কুলে পড়বার সময় সদা সর্বদাই আমরা মাস্টারমশাইদের মর্যাদা রেখে চলেছি একথা বোধ করি আমরা যেমন বলতে পারব না, তেমনি মাস্টারমশাইরাও তা মানবেন না। তবু তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা এমন ছিল যা ভয়, মর্যাদা, চপলতা, শ্রদ্ধা, দুষ্টুমি এবং প্রশ্রয়ের মিশ্র রসে তৈরি। অলংকার শাস্ত্রের নববিধ রসের মধ্যে এ রসের নাম নেই, কিন্তু সেটা যে শুধুই নিরঙ্কুশ ভক্তিরস তা মোটেই নয়; মাস্টারমশাইরাও বোধ করি সে কথা স্বীকার করবেন। এখনকার দিনে একটি ছেলের অভিভাবক হয়েও যে অবনতিতে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাতে মনে হয় যেন আমি একটি গো-মূর্খ এবং পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যা যেন সেই শিক্ষকের মস্তকস্থ হয়ে আছে। আমাদের সময়ে একজন অভিভাবক তীর্থপতি ইস্কুলের হেডমাস্টারমশায়ের কাছে যে সম্মান পেতেন, তাতে একজন ছাত্র যে যতই ছোট হোক তার নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারত।